লিপি
শিলিগুড়ি, শুক্রবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮
Siliguri • Friday • September 14, 2018
Arthik Lipi, Page 4

শুক্রবার, ২৮ ভাদ্র, ১৪২৫
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ২৫৮

মারাঠা সংরক্ষণের ইস্যু নিয়ে আলোচনা দরকার

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর একাত্তর বছর পার হয়ে গেলেও দেশের বিভিন্ন অংশ মাঝে মাঝেই তপ্ত হচ্ছে সংরক্ষণ ইস্যুতে। অতীতে ভোটের বাক্স ভর্তি করার জন্য সংরক্ষণকে কাজে লাগিয়েছেন একদল রাজনীতিক। সেই ধারা এখনও চলছে। অবশ্যই এর যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে। কিন্তু এ নিয়ে কোনও আন্দোলন যাতে মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে, তা সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের দেখা উচিত। কারণ এ সম্পর্কে অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। এখন গুজরাতে প্যাটেল সম্প্রদায় সংরক্ষণের দাবিতে সরব। এ নিয়ে দীর্ঘ আন্দোলন চলছে। এরই মধ্যে সংরক্ষণের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়েছে মহারাষ্ট্রে। এই রাজ্যে সংরক্ষণের দাবিতে সরব মারাঠা সম্প্রদায়। ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্রের আহমেদনগরে ১৭ বছরের এক কিশোরীকে সংরক্ষণের দাবিতে জীবন দিয়ে মাশুল দিতে হল। এই কিশোরী একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। কিশোরী মারাঠা সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণের দাবি জানিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে ,

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

(সকলের হাস্য)। উস্‌খুস্‌ করছে, তাকে দেখে মালিনী এসে বললে—কেন গো—ঘুমচ্ছিস নি কেন গো? মেছুনী বললে কি জানি মা কেমন ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না, তুমি একবার আঁষচুবড়িটা আনিয়ে দিতে পার? তখন মেছুনী আঁষচুবড়িতে জল ছিটিয়ে সেই গন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হল।" (সকলের হাস্য)।

বিদায়ের সময় কেশব ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করা একটি ফুলের তোড়া গ্রহণ করিলেন ও ভুমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া 'বিধানের জয় হউক' এই কথা ভক্তসঙ্গে বলিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মভক্ত জয়গোপাল সেনের গাড়িতে কেশব উঠিলেন; কলিকাতায় যাইবেন।

(গ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুরেন্দ্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন

রাম, মনোমোহন, ত্রৈলোক্য ও মহেন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি সঙ্গে

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে সুরেন্দ্রের বাড়িতে আসিয়াছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আষাঢ় মাসের একদিন। সন্ধ্যা হয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ পূর্বে বৈকালে শ্রীযুক্ত মনোমোহনের বাড়িতে একটু বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রের দ্বিতলের বৈঠকখানার ঘরে ভক্তেরা আসিয়াছেন। মহেন্দ্র গোস্বামী, ভোলানাথ পাল ইত্যাদি প্রতিবেশীগণ উপস্থিত আছেন। শ্রীযুক্ত কেশব সেনের আসিবার কথা ছিল কিন্তু আসিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল ও আরও কতকগুলি ব্রাহ্মভক্ত আসিয়াছেন।

বৈঠকখানা ঘরে সতরঞ্জ ও চাদর পাতা হইয়াছে—তার উপর একখানি সুন্দর গালিচা ও তাকিয়া। ঠাকুরকে লইয়া গিয়া সুরেন্দ্র ঐ গালিচার উপর বসিতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, একি তোমার কথা। এই বলিয়া মহেন্দ্র গোস্বামীর পার্শ্বে বসিলেন। যদু মল্লিকের বাগানে যখন পারায়ণ হয় শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা যাইতেন। কয়মাস ধরিয়া পারায়ণ হইয়াছিল।

মহেন্দ্র গোস্বামী (ভক্তদের প্রতি)---আমি এঁর নিকট কয়েকমাস প্রায় সর্বদা থাকতাম। এমন মহৎ লোক আমি কখনও দেখি নাই। এঁর ভাব সকল সাধারণ ভাব নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি)—ও সব তোমার কি কথা। আমি হীনের হীন, দীনের দীন; আমি তাঁর দাসানুদাস ; **কৃষ্ণই মহান্‌।**

"যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। দূর থেকে দেখলে সমুদ্র নীলবর্ণ দেখায়, কাছে যাও কোন রং নাই। যিনিই সগুণ, তিনিই নির্গুণ; যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা।"

"শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ কেন? রাধার প্রেম।"

"যিনিই ব্রহ্ম তিনিই কালী, আদ্যাশক্তি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। যিনিই কৃষ্ণ তিনিই কালী।"

"মূল এক---তাঁর সমস্ত খেলা, লীলা

দিনপঞ্জিকা

২৮ ভাদ্র, ভাঃ ২৩ ভাদ্র, **১৪ সেপ্টেম্বর,** ২৮ ভাদ্, সংবৎ ৫ ভাদ্রপদ সুদি, ৩ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪১। **শুক্রবার,** পঞ্চমী সন্ধ্যা ঘ ৫।৩৭ মিঃ। বিশাখানক্ষত্র অহরাত্র। ইন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৫।২৯ পরে বৈধৃতিযোগ শেষরাত্রি ঘ ৪।১৯ মিঃ। ববকরণ, প্রাতঃ ঘ ৫।৪৮ গতে বালবকরণ, সন্ধ্যা ঘ ৫।৩৭ গতে কৌলবকরণ। **জন্মে**– তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ঘ ১১।২৪ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ। **মৃতে**– দ্বিপাদোষ। **যোগিনী**– দক্ষিণে, সন্ধ্যা ঘ ৫।৩৭ গতে পশ্চিমে। **বারবেলাদি** ঘ ৮।৩০ গতে ১১।৩৩ মধ্যে। **কালরাত্রি**–ঘ ৮।৩৭ গতে ১০।৫ মধ্যে। **যাত্রা**– নাই। **শুভকর্ম্ম**-- নাই। **বিবিধ**– পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **ষট্‌পঞ্চমী ব্রত। রক্ষাপঞ্চমী ব্রত। নির্ণয় সিন্ধ মতে ঋষি পঞ্চমী। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত শ্রীশ্রীমনসাদেবী ও অষ্টনাগ পূজা। অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৬।১৮ মধ্যে ও ৭।৫ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ৩।১ মধ্যে ও ৩।৪৮ গতে ৫।৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।১২ গতে ৯।২৬ মধ্যে ১১।৫১ গতে ৩।৫ মধ্যে ও ৩।৫৩ গতে ৫।২৬ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৮ ভাদ্র, ভাঃ ২৩ ভাদ্র, ১৪ সেপ্টেম্বর, ৩ মহরম, ২৮ ভাদ্, উঃ ৫/২৪, অঃ ৫/৩৯, শুক্রবার, পঞ্চমী সন্ধ্যা ঘ ৫/৩৬, সেহ্‌রী শেষ ৪/০২, ইফতার ৫/৪৬। **মহাপুরুষ শ্রী শ্রী হঁরিদেবর আবির্ভাব তিনি পালন (অসম)**

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে গুরুধাম বেঙ্গাই

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

পর্ব ১

১. প্রাসঙ্গিক কথন

'শ্রীশ্রীগুরুগীতা'য় ১৪ নম্বর শ্লোকে আছে---গুরু নিবাস কাশীক্ষেত্র। আবার 'যোগিনীতন্ত্রে আছে---গুরুর নিবাসস্থান কৈলাসধাম, গুরুর গৃহ চিন্তামণিগৃহ, গুরুভবনস্থিত বৃক্ষসকল কল্পবৃক্ষ, লতাসমস্ত কল্পলতা, সমস্ত খাতজল গঙ্গা, গুরুর গৃহে অবস্থিত দাসীসমস্ত ভৈরবীস্বরূপা, ভৃত্যবর্গ ভৈরবস্বরূপ---মতিমান সাধক সর্বদা এই রূপে গুরুর স্বরূপ চিন্তা করিবেন। মহেশ্বরি, গুরুস্থানকে যিনি একবার প্রদক্ষিণ করিয়াছেন, তিনি সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। এই পুণ্যময় ধামে সমস্তই পুণ্যময়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গুরুর নিবাস বেঙ্গাই গ্রামের ভট্টাচার্যপাড়ায়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মন্ত্রদাতা গুরু শক্তিসাধক কেনারাম ভট্টাচার্যই পরবর্তী সময়ে 'স্বামী পূর্ণানন্দ' নামে জগজ্জননী শ্রীমা সারদাদেবীকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষাদান করেছিলেন। তিনি কুলগুরু হিসাবে কামারপুকুরের রামকুমার, রামেশ্বর, রামলাল, লক্ষ্মীমণি, শিবরাম এবং শিহড়ের শিবানন্দ সরস্বতী প্রমুখকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই গুরু এবং তাঁর নিবাস এতদিন স্মরণ ও চর্চার অন্তরালেই পড়েছিল।

স্বামী পূর্ণানন্দের মন্ত্রশিষ্য শিহড় নিবাসী শক্তিসাধক স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী 'গুরুপ্রণাম' শ্রদ্ধাঞ্জলিতে ব্যক্ত করেছেন, "বেঙ্গাই গ্রামের ভট্টাচার্য বংশোদ্ভুত স্বামী পূর্ণানন্দ (কেনারাম ভট্টাচার্য) কালিকাসাধক। তিনি গৃহী ও সন্ন্যাসী। সপ্ততীর্থ পরিভ্রমণান্তে তিনি স্বামী পূর্ণানন্দ নামে অভিষিক্ত হয়ে জন্মভূমি পরিভ্রমণে আসেন এবং তথায় স্বল্পকালে অবস্থান করে পুনরায় সন্ন্যাস প্রব্রজ্যায় নির্গত হন। তিনি নিজে সিদ্ধযোগী, গুরু এবং সাধক চূড়ামণির (শ্রীরামকৃষ্ণ) দীক্ষাগুরু। তাঁর দীক্ষাগুণে সাধকচূড়ামণি মৃন্ময়ীমূর্তিতে চিন্ময়ীরূপ দর্শন করেন।[1]

যতদূর জানা যায়, স্বামী পূর্ণানন্দ ওরফে কেনারাম ভট্টাচার্য আনুমানিক ১১৯৬ বঙ্গাব্দে (১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে) বৈশাখের অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে বেঙ্গাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কেনারামের জীবনের অনেকখানি সময় অতিবাহিত হয়েছিল বেঙ্গাই ভট্টাচার্য পাড়ায়। তিনি তাঁর বাসস্থানের কাছে পঞ্চমুণ্ডের আসন নির্মাণ করে সেখানে জপ-ধ্যানাদি করতেন। দ্বাদশ শিবালয় ও চতুষ্পাঠীগুলি ধ্বংস হয়ে গেলেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মহাকালী মন্দির'টি আজও তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে।[2] জমিদার বংশীয় বৈদ্যনাথ লাহা লিখেছেন, "বেঙ্গাই নামক গ্রামে প্রভু গদাধরের পিতৃ পুরুষগণের ইষ্টদেবের বাসস্থান ছিল। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের অভিষ্টদেব তন্ত্রোক্তসাধক ছিলেন। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডির বেদীর উপর কালীমাতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।"[3]

পূর্ণানন্দ সম্পর্কে কালীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "বেঙ্গাই গ্রামের পূর্ণানন্দ ভট্টাচার্য রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গুরু ছিলেন। ভট্টাচার্যপাড়ার ব্রাহ্মণগোষ্ঠী শাক্ত এবং ইহাদের ছিল পঞ্চমুণ্ডীর আসন। পূর্ণানন্দ হইতেই পরমহংসদেবের মাতৃমন্ত্রের সাধকজীবনের শুরু। বিষ্ময়কর যে, সিমলায়িগামী লোকেরাই বঙ্গদেশে কলিযুগের অবতার দুইয়ের গুরু হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু কেশবভারতীও তদ্রুপ ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিমলায়িগামী গুরু পূর্ণানন্দ ভট্টাচার্য।[4] পূর্ণানন্দ

বা কেনারাম সম্পর্কে অনেকেই কলম ধরেছেন। লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ, ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, স্বামী গম্ভীরানন্দ ছাড়াও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার রায়, ড. তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায়, কেনারাম ভট্টাচার্য ও স্বামী পূর্ণানন্দ পৃথক ব্যক্তি নন। গার্হস্থ্জীবনে যিনি কেনারাম, সন্ন্যাসজীবনে তিনিই পূর্ণানন্দ।

২. অতীতের গ্রামখানি

কামারপুকুরের দু'মাইল উত্তরদিকবর্তী একটি বর্ধিষ্ণু ও ঐহিত্যবাহী প্রাচীন গ্রামের নাম বাসুদেবপুর। অধুনা বাসুদেবপুর 'বেঙ্গাই' নামে পরিচিত। প্রাচীন গ্রন্থে কামারপুকুরের উল্লেখ না থাকলেও 'বাসুদেবপুর' গ্রামের নাম আছে। জাহানাবাদ পরগণার অপর একটি মৌজার নাম 'বাসুদেবপুর' থাকায় জেলা কালেক্টর থেকে কাজ চালানো বিভ্রান্তিকর মনে করেই বেঙ্গাই মৌজার নামকরণ হয়। পূর্বে গ্রামের উত্তরপ্রান্তে বহু বণিক অর্থাৎ বেনে সম্প্রদায়ের বাস ছিল। তাদের বসবাসের ফলে এই গ্রামটি প্রথমে বেনেপুকুর, বেনেকুলি বা বেনেবাগান নামে পরিচিত ছিল। বেনেদের গাই-এর দুধ খুবই ভাল ছিল। এই 'বেনেদের গাই' থেকে অপভ্রাংশ হয়ে বেনেগাই, বেনগাই বা বেঙ্গাই নামকরণের সূত্রপাত। অন্য মতে, গ্রামে প্রচুর পুকুর-ডোবা থাকায় ব্যাঙের আবাস ছিল। কচিকাঁচারা 'ব্যাঙ আয়' বলে ডাকতো। তাই 'ব্যাঙাই' বা বেঙ্গাই হয়ে থাকতে পারে। 'বেঙ্গা' নামক গ্রামের পার্থক্য রাখতেও 'বেঙ্গাই' নাম হতে পারে।[5]

তখনকার দিনে সকাল না হতেই মানুষ চাষের কাজে বেরিয়ে যেত। কারণ অধিকাংশ মানুষই কৃষিনির্ভর ছিল। তাদের অধিকাংশেরই খালি পা, কারো কাঁধে বা মাথায় বাঁধা গামছা। মালকোচা দেওয়া আটহাতি ধুতি। রাস্তাঘাট কাঁচা, আলপথ, মাটির ঘরবাড়ি, খড়ের ছাউনি। আশেপাশে গাছগাছালিতে পূর্ণ। পুরো গ্রামটি গভীর জঙ্গলে আকীর্ণ। দিবাভাগেও বনের অভ্যন্তরে সূর্যের আলোক রশ্মি পৌঁছাত না। বেঙ্গাই চৌমাথাটি ছিল মহাশ্মশান, ঠ্যাঙ্গাড়েদের আড্ডা। জনমানবহীন প্রান্তর, চারিদিকে শুধু ধূ ধূ মাঠ। সন্ধ্যার অন্ধকার নামার পূর্বেই পথচারী প্রাণভয়ে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছানের চেষ্টা করত। ব্যর্থ হলেই নির্ঘাৎ প্রাণ যেত ঠ্যাঙ্গাড়ের হাতে। ব্রাহ্মণ ছাড়াও সদগোপ, তিলি, তাঁতি, হাড়ি, ডোম, মাঝি, বাগদী সব সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি বাস করতেন। শিক্ষিতের হার খুবই কম ছিল।

নিরিবিলি ও শান্ত পরিবেশ লক্ষ্য করে আদিপুরুষ রাজেন্দ্র ঠাকুর শক্তিসাধনার স্থান হিসাবে এখানে থেকে যান। দীর্ঘদিন ধরে তিনি মহাকালীর সাধনায় কাল কাটান। এখানে তিনি একটি পুষ্করিণীর তীরে বিল্ববৃক্ষতলে পঞ্চমুণ্ডের আসনে তন্ত্র মতে কালী আরাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে কথিত। সে সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই দুর্বল ছিল। স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখেছেন, তখনকার দিনে অধিকাংশ লোক কামারপুকুর, বেঙ্গাই, চৌরাস্তা, কুমারগঞ্জ, একলক্ষ্মী, উচালনের পথে পদব্রজে চলিয়া ও চটিতে বিশ্রাম করিয়া বর্ধমানে উপস্থিত হইতেন এবং তথায় ট্রেনে চড়িতেন। সঙ্গতিসম্পন্ন বিরল দুই চারিজন পালকী প্রভৃতির সাহায্য লইতেন। সমস্ত পথেই তখন দস্যুভয় ছিল। ঐ পথে গোযানে দ্রব্যসম্ভার গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রেরিত হইত।[6]

তৎকালে বেঙ্গাই একটি প্রাচীন সমৃদ্ধশালী গ্রাম ছিল। স্থানটি ছিল সংস্কৃত-সংস্কৃতির পীঠস্থান। ব্রাহ্মণপ্রধান পাড়ায় বাইশটি চতুষ্পাঠী ও দ্বাদশ শিবালয় ছিল। পণ্ডিতেরা বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করতেন। দেশ-বিদেশের বিদ্যার্থীরা এসে চতুষ্পাঠীতে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যায়ণ করতেন এবং উপাধিলাভের পর নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন। চতুষ্পাঠীগুলির শিরোমণি ছিলেন তখনকার বিশিষ্ট পণ্ডিত সিমলায়ীগামী গদাধর তর্কালঙ্কার। ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সমসাময়িক ছিলেন। দয়ারাম তর্কচুড়ামণী, বেচারাম ন্যায়ভূষণ, রামতনু বিদ্যাভূষণ[7] চতুষ্পাঠীগুলি মুখ্যপরিচালক এবং কালিকাদেবীর প্রধান পুরোহিত ছিলেন। গদাধর তর্কালঙ্কারের লোকান্তরে তাঁর পুত্রদ্বয় হরচূড়ামণি ও মৃগেন্দ্র চতুষ্পাঠীগুলি চালাতেন। তাঁদের লোকান্তরে চতুষ্পাঠীগুলি উঠে যায় এবং দ্বাদশ শিবালয় সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংস হয়।

৩. মন্দির ঐতিহ্য

বেঙ্গাই গ্রামের প্রধান ও প্রাচীন মন্দির বলতে পূর্ণানন্দ প্রতিষ্ঠিত মহাকালী মন্দির। ড. তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বেঙ্গাই কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী পূর্ণানন্দ নন, তাঁর পূর্বপুরুষগণ। তবে দেবীর পঞ্চমুণ্ডের আসন নির্মাণ তাঁর অন্যতম কীর্তি হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।"[8] নিকটেই প্রাচীন দুর্গামণ্ডপ ও শঙ্কেশ্বর শিবের মন্দির। মহাদেবের বক্ষের উপর নানালংকারে ভূষিতা ত্রিণয়না চতুর্ভূজা দক্ষিণাস্যা মহাকালী বিরাজিতা। বিগ্রহের পশ্চিমে ত্রিশূল, গৌরীপট্টযুক্ত কৃষ্ণপ্রস্তরের একটি শিবলিঙ্গ ও পাশে আরও দুটি পট্টবিহীন শিবমূর্তি। ঠিক তারই সামনে সিংহাসনে গোষ্পদচিহ্নিত রাজরাজেশ্বর, অন্য দুটি বিষ্ণু, কৃষ্ণ, গোপাল ও শীতলা নিত্যপূজিতা হন। মহাকালীর মন্দিরটি পূর্বে খড়ের চাল ও মাটির দেওয়ালযুক্ত ছিল। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে মেঝেটি পাকা করা হয়। এরপর ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নতুনভাবে মন্দিরটি সংস্কার কার হয়। পঞ্চমুণ্ড বেদীটি একইভাবে মাটির রয়েছে। বাৎসরিক বিশেষ পূজা হয় ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের শনিবার। এই সময় ছাগ বলি হয়। শাক্ত পরিবারের শুভকর্মের আগে আজও বিশেষ পূজা প্রচলিত আছে। গ্রাম্য দেবী মহাকালী শুভাশুভের বিধাত্রী, গ্রামবাসীর রক্ষাকর্ত্রী। পূর্ণানন্দের দৌহিত্রী বংশধর ওরফে দুর্গাপদ মায়ের পূজার্চ্চনা করেন।

ক্রমশ

প্রসঙ্গ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি : একটি পর্যালোচনা

ভি. শ্রীনিবাস

পর্ব ২

তপশিলি সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত ক্ষমতায়নের জন্য রয়েছে মাধ্যমিক পরিবর্তী স্তরের পড়াশুনা চালাবার জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা। এতে করে মাধ্যমিক পরবর্তী স্তরগুলির শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে আর্থিক মদত মেলে তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে। রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফি, বই-ব্যাঙ্ক বাবাদ সুবিধা ও অন্যান্য ভাতা এই আর্থিক সহায়তার মধ্যে পড়ে। বাবু জগজীবন রাম ছাত্রাবাস যোজনায় মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তপশিলি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। স্নাতকোত্তর স্তরের তপশিলি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে এমফিল ও পি.এইচ.ডি. ফেলোশিপের ব্যবস্থা করেছে। নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও পি.এইচ.ডি. স্তরের তপশিলি ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে পড়াশোনার ক্ষেত্রে আর্থিক মদত জোগাতে National Overseas Scholarships Programme নামক কর্মসূচি রূপায়ণ করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

তপশিলি জাতিভুক্তদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তপশিলি জাতি উপ-পরিকল্পনার (Scheduled Castes Sub-Plan – SCSP) আওতায় বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়া হয়। রাজ্য তপশিলি জাতি উন্নয়ন নিগমগুলি কেন্দ্রের সাহায্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণ করছে। এর আওতায় ঋণ, মার্জিন মানি ও ভরতুকির সংস্থান করা হয়। তপশিলি জাতিভুক্ত পরিবারগুলিকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার জন্য জাতীয় তপশিলি অর্থ ও উন্নয়ন নিগম স্থাপন করা হয়েছে। দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা

National Scholarship Portal
WebExam
Online Application Process

তপশিলি যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বিকাশ ও ব্যবসা পরিচালনার প্রশিক্ষণও দেয় এই নিগম। সাফাই কর্মী ও মালবাহকদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়েছে সাফাই কর্মচারী অর্থ ও উন্নয়ন নিগম।

· **প্রতিবন্ধী মানুষজনের (দিব্যাঙ্গজন) ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত দপ্তর :** এই দপ্তর বা বিভাগ প্রতিবন্ধী মানুষজনের কল্যাণ ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রণীত ও বলবৎ বিভিন্ন আইনকানুন নিয়ে কাজ করে। এই আইনগুলি হল—Rehabilitation Council of India Act 1992, The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act 1955, National Trust for the Welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 1999) ইত্যাদি।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অধীনে তিনটি বিধিবদ্ধ সংস্থা আছে। দিব্যাঙ্গদের পুনর্বাসিন ও বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণির পেশাদারদের জন্য প্রশিক্ষণ নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি স্থির করার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে ভারতীয় পুনর্বাসিন পর্ষদের উপর ১৯৫৫ সালে প্রণীত Persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) আইনের অধীনে একজন মুখ্য কমিশনারকে বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবন্ধী মানুষদের সঙ্গে সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালনায় নিযুক্ত কমিশনারদের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করার জন্য যাবতীয় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল ট্রাস্ট বা জাতীয় অছি পরিষদ আর একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা, যার কাজ প্রতিবন্ধী মানুষজনকে যথাসম্ভব আত্মনির্ভরভাবে জীবন কাটাতে সাহায্য করা এবং প্রয়োজন মাফিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত নথিভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। ভারতে প্রতিবন্ধী মানুষজনের হরেক সমস্যা রয়েছে। প্রতিবন্ধকতার মূল ক্ষেত্রগুলির সমস্যা মোকাবিলায় ৬-টি শীর্ষস্থানীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে। প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণদানের সুযোগ বাড়াতে ভারতে শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান হল National Handicapped Finance And Development Corporation বা জাতীয় প্রতিবন্ধী অর্থসংস্থান ও উন্নয়ন নিগম। দিব্যাঙ্গজনদের জন্য প্রতিবন্ধকতামুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর গোটা দেশজুড়ে 'Accessible India' বা 'নাগালের মধ্যে ভারত' নামক ফ্ল্যাগশিপ প্রচারাভিযানের সূচনা করেছেন।

· **আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক :** তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক পরিকল্পিত ও সমন্বিত পথে এগোতে লক্ষ্যভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণের উদ্দেশ্য নিয়ে আদিবাসী বিষয়ক পৃথক মন্ত্রক গঠিত হয়েছিল। সংবিধানের ২৪৪ (১) নং ধারায় তপশিলভুক্ত এলাকাগুলি প্রজ্ঞাপিত করা হয়। ২৪৪(২) নং ধারায় অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরামের এই তপশিলভুক্ত এলাকাগুলিকে আদিবাসী এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির জন্য গঠন করা হয় জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক রাজ্যগুলিকে আদিবাসী উপ-পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহায্য, সংবিধানের ২৭৫(১) ধারায় আওতায় অনুদান, একলব্য আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়ের জন্য অনুদান, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য শিক্ষা অনুদান, আদিবাসী উপ-পরিকল্পনা প্রকল্প এলাকায় আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনুদান, ছোটখাটো বনজ সামগ্রীর জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হিসাবে জীবিকা সহায়ক অনুদান প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করে এছাড়াও মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ভারতীয় আদিবাসী সমবায় ও বিপণন ফেডারেশন এবং রাজ্য আদিবাসী সমবায় ও বিপণন ফেডারেশনগুলিকে ইক্যুইটি সহায়তা জোগানো হয়। আদিবাসীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তাদের আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে তুলতে স্বরোজগার উদ্যোগ স্থাপনে অর্থ সহায়তা দেয় জাতীয় তপশিলি উপজাতি অর্থসংস্থান ও বিকাশ নিগম। আদিবাসীদের অধিকারের সুরক্ষায় সংবিধানের ৩৩৮এ ধারার আওতায় স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে গঠন করা হয়েছে জাতীয় তপশিলি উপজাতি কমিশন।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

পৌরসভা থেকে পৌর নিগম

১৯৮৪ সালে পৌরসভা থেকে হাওড়া পৌর নিগম (এইচ এম সি) হয়েছিল। পঞ্চাশটা ওয়ার্ড নিয়ে এই পৌরনিগমের প্রথম ভোট হয়। সেই ভোটের ফলাফল হয়েছিল ২৬ ও ২৪। অর্থাৎ বামফ্রন্ট পেয়েছিল ২৬টি আসন। আর কংগ্রেস পেয়েছিল ২৪টি আসন। প্রথম পৌর নিগমের মেয়র হয়েছিলেন অলকদূত দাস এবং ডেপুটি মেয়র হয়েছিলেন ৪০নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা দেবেশ স্যানাল। এরপর লাগাতার বামফ্রন্ট হাওড়া পৌর নিগমের বোর্ড চালিয়ে এসেছে। ২০১৩ সালে সেই বোর্ড চলে আসে তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে। বর্তমানে ৬৬টি ওয়ার্ড হাওড়া পৌর নিগমে। হাওড়া পৌরনিগমের মেয়র হিসাবে বসেছেন ডঃ রথিন চক্রবর্তী মহাশয়। এবছর পৌর নিগম হবার পর অষ্টমবার ভোট হতে চলেছে। এর আগে হাওড়া পৌরসভায় প্রথমবার প্রথম ভোট হয়েছিল ১৯৮৪ সালের ২৯ নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর। সেদিন তারাই ভোট দিতে পারতেন, যারা সমাজের বিশিষ্টজন ছিলেন। সেদিন বিশিষ্টজন হিসাবে ২৬৫২ জন ভোট দিয়েছিলেন। তারও আগে হাওড়া পৌরসভা ছিল শিবপুর অঞ্চলে। বর্তমানে সাজের আটচালা নামেই বিখ্যাত হয়ে আছে। হাওড়া পৌর নিগম মানেই মানুষের পরিষেবাটা সঠিকভাবে তুলে দিতে হবে। পৌর থেকেই পরিষেবা কথাটা এসেছে। সে যে কোনও পৌরসভা বা পৌরনিগম হোক না কেন। মানুষ ভাল একটা পরিষেবা পাবে বলেই পৌরসভা বা পৌর নিগমের অফিসে আসেন। বর্তমানে হাওড়া পৌরনিগম হাওড়ার মানচিত্রটাই বদলে দিয়েছে। রাস্তা, পানীয় জল, আলো, ভ্যাট বিভিন্ন প্রান্তে বাসস্ট্যান্ড এবং মনিষীদের মূর্তি বসিয়ে হাওড়া পৌরনিগম তার কর্ম ও দায়িত্ব পালন করেছে। এবং বিভিন্ন জায়গায় পার্ক করে একটা সুন্দর পরিবেশ রচনা করেছে। পরিষেবা হিসাবে ২০১৮ সালে নতুন সংযোজন হয়েছে বাড়ির ট্যাক্স বিল, যা একসময় ৪নং মহাত্মাগান্ধী রোড হাওড়া পৌর নিগম অফিসে এসে দীর্ঘ লাইন দিয়ে দিতে হত। সেই ট্যাক্স বিল বোরো অফিসে দেওয়া যাবে, অথবা অনলাইনেও দেওয়া যাবে। পৌর মানেই পরিষেবা। সেটাই হাওড়া পৌর নিগম মানুষের কাছে তুলে ধরেছে।

প্রবীর মিত্র

হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

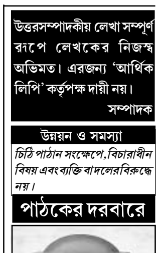

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য
সম্পাদক দায়ী নয়